চিন্তার সীমানা

ইমাম রাযিকে লেখা ইবনে আরাবীর চিঠি

ভাষান্তর:ইমদাদ হুসেইন খান

চিন্তার সীমানা

ফখরুদ্দিন রাযির নিকট লিখিত ইবনে আরাবীর চিঠি

মূল-রচনা: *শেখ আল-আকবর*

মুহিউদ্দিন ইবনে আরাবী

(১১৬৫ মুর্সিয়া, স্পেন - ১২৪০ দামেস্ক, সিরিয়া)

ভাষান্তর: **ইমদাদ হুসেইন খান**

১ম ই-বুক সংস্করণ

প্রকাশকাল : সফর, ১৪৩৮ হিজরি
নভেম্বর, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

প্রকাশনা : মেটাকেভ পাবলিকেশন্স
www.metakave.com/publications

প্রচ্ছদ : সাদিক মোহাম্মদ আলম

বইটির কোনো কপিরাইট বা গ্রন্থস্বত্ব নেই। পবিত্রজ্ঞানের কোনো ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠিগত স্বত্ব থাকা কাম্য নয়। যে কেউ যেকোনো স্থান হতে এবং মাধ্যমে এই বইটি প্রকাশ করতে পারেন। তবে এক্ষেত্রে **একমাত্র শর্ত হচ্ছে,** কোনোরূপ **পরিবর্তন, পরিবর্ধন, বিয়োজন** ব্যতীত **হুবহু প্রকাশ করতে হবে**। অনুবাদ প্রকাশের ক্ষেত্রে অনুবাদকের নাম উল্লেখ করার অনুরোধ রইলো। যোগাযোগের জন্য ইমেইল: publications@metakave.com.bd

অনুবাদকের ভূমিকা

এই পুস্তিকাটি মূলত শেখ আল-আকবর মুহিউদ্দিন ইবনে আরাবী আল হাতেমীর (১১৬৫ মুর্সিয়া, স্পেন - ১২৪০ দামেস্ক, সিরিয়া) লিখিত একটি পত্রের (রিসালা ইলা ইমাম রাযি) বাংলা অনুবাদ। যেটি বিখ্যাত দার্শনিক, ধর্মতত্ত্ববিদ, চিকিৎসক, বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক বহুমুখি প্রতিভার অধিকারী ইমাম ফখরুদ্দিন আর রাযির[১] নিকট লেখা হয়েছিল।

চিন্তা ও গবেষণার চূড়ান্ত ধাপে মানুষ যতোই উন্নীত হোক না কেন, যতক্ষণ না সে তার নিজ-সত্তাকে সত্যিকারভাবে অবগত হচ্ছে, ততক্ষণ সে দিশেহারাভাবে এদিক-ওদিক ঘুরতে থাকবে। নিজ-সত্তাকে জানার মাধ্যমেই আপনাকে পরম-সত্যের বা মহামহিম আল্লাহ্‌র তত্ত্বজ্ঞান লাভ করতে হবে। এই পথটি চিন্তা-গবেষণার মাধ্যমে পাড়ি দেওয়া যাবে না। কেননা তা চিন্তা-গবেষণা, যুক্তির বহু-উর্দ্ধে। কিন্তু বহু জ্ঞানী-গুণীজন এই ভুলটি করে থাকেন। তারা ভাবেন চিন্তা-গবেষণা, যুক্তির মাধ্যমে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে। চিন্তা-গবেষণা, যুক্তিই তাদেরকে আল্লাহ্‌র কাছে নিয়ে যাবে, ফলে তারা নিজেদের সমস্তটুকু উজাড় করে দেন কিন্তু শেষমেশ দিশেহারাভাবে এদিক-ওদিক পথ হাতড়াতে থাকেন। এই নাজুক বিষয়টিকে বুল্লেহ শাহ[২] তার কবিতায় বেশ সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন।

পড় পড় আলিম ফাযিল হয়ো — পড়ে পড়ে আলেম হও জ্ঞানী হও
কাদি আপনে আপনু পড়িয়াই নেই — কিন্তু কখনো তো নিজেকে পড়লে না

এই ব্যাপারটি ঘটেছিল ইমাম রাযির ক্ষেত্রে। তিনি ত্রিশ বছর ধরে চিন্তা-গবেষণা, যুক্তির মাধ্যমে যে অনুসিদ্ধান্তে পৌছে ছিলেন এক নিমেষেই আরেকটি যুক্তি এসে তার ভিত্তি নড়িয়ে দেয়। আর তিনি এই ব্যাপারেও সন্দিহান যে, নতুন অনুসিদ্ধান্তটিকে না আবার আরেকটি প্রমাণ এসে উড়িয়ে দেয়। দিশেহারা হয়ে তিনি একসময় কাঁদতে শুরু করেন। যে দৃশ্যটি তাঁর সাথীরা অবলোকন করে। তাদের

[১] বিখ্যাত এই দার্শনিক ১১৪৯ সালে বর্তমান ইরানে জন্ম নেন এবং ১২০৯ সালে বর্তমান আফগানিস্থানে ইন্তেকাল করেন। 'মাফাতিহুল গাইব' বা তাফসীরে কবীর তার অনবদ্য সৃষ্টি।

[২] পাঞ্জাবের বিখ্যাত সুফি-দার্শনিক। যার জন্ম ১৬৮০ সালে এবং মৃত্যু ১৭৫৭ সালে পাঞ্জাবের কাসুরে। তিনি বাবা বুল্লেহ শাহ নামেই বেশি পরিচিত। তাঁর বহু কবিতা আজো মানুষের মুখে মুখে পরিচিত যেগুলো বর্তমানে কাওয়ালি হিসেবে গাওয়া হয়।

মধ্যেকার একজন পুরো বিষয়টি শেখ আল আকবরকে জানায়। তাই ইমাম রাযিকে উপদেশস্বরূপ তিনি এই পত্রটি লিখেন। এতে সংক্ষেপে তিনি চিন্তা-গবেষণা, যুক্তির সীমাবদ্ধতা তুলে ধরেন এবং কিছু আধ্যাত্মিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। সংক্ষেপ হলেও প্রতিটি লাইন খুবই তাৎপর্যময়। চাইলে এই পুস্তিকাটির ব্যাখ্যা লেখা যায় যেটা একটা বৃহৎ বই হবার যোগ্যতা রাখে। আপাদত আমরা অনুবাদেই সীমাবদ্ধ থাকি।

অনুবাদের জন্য আমি লেবাননের বৈরুতের দারুল-কুতুব ইলমিয়াহ হতে ২০০১ সালে প্রকাশিত 'রাসাইলে ইবনে আরাবী'র প্রথম সংস্করনকে ব্যবহার করেছি। এটি মূলত ভারতের হায়দারবাদের 'দায়িরাতুল মাআরিফ আল উসমানিয়া' প্রকাশনা কর্তৃক প্রকাশিত 'রাসাইলে ইবনে আরাবী' নামক বিখ্যাত সংস্করনের প্রতিলিপি।

মূল বইটিতে কোনো অনুচ্ছেদ ছিলো না। পাঠকের সুবিধার্থে আমি অনুচ্ছেদ যোগ করেছি। টিকাতে আরবি শব্দগুলোকে উল্লেখ করেছি।

বাংলা ভাষায় শেখ আল আকবরের কোনো বই অনুদিত হয়েছে কিনা সন্দেহ আছে, তবে আমার জানা মতে হয়নি। যেটা আসলেই আমাদের দুর্ভাগ্য। আমাদের এই বাংলা ভাষায় তাঁর লেখাসমূহ অনুদিত হওয়া খুবই জরুরী। বিশেষ করে আজকের এই আধুনিক যুগে তো তা আরোও বেশি প্রয়োজনীয়। সে বিষয়টিকে সামনে রেখে অধমের এই বিনিত প্রচেষ্টা।

ইমদাদ হুসেইন খান
সফর, ১৪৩৮ হিজরী

ব্যবহৃত পরিভাষাসমূহ

মারিফত	তত্ত্বজ্ঞান / ঈশ্বরজ্ঞান
ফিকর	চিন্তা-গবেষণা
নযর	চিন্তা-পর্যবেক্ষণ
আকল	বোধশক্তি, চিন্তাশক্তি
মুহদাছ	অনিত্য জিনিস
রিয়াযাত	প্রচেষ্টা
মুজাহাদাত	আধ্মাতিক-সাধনা
খালওয়াত	অবমুক্তকরণ, নির্জনতা অবলম্বন
সবব	কার্যকারণ
তাজাল্লিয়াত	আত্মবিকিরণ, খোদার নুরের ছটা
আল-হাক্ক	পরম সত্য
তাহাইয়ুলল ফি সুরাত	আকৃতির-বিবর্তন
মুশাহাদা	প্রত্যক্ষকরণ, খোদায়ী দর্শন

(বাংলা অনুবাদ আরম্ভ)

চিন্তার সীমানা

রিসালা ইলা ইমাম রাযি

এর বাংলা অনুবাদ

بِسْمِ اللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

আল্লাহ্‌র নামে যিনি রহমান, রহিম

সূচনা

এই পত্রটি শেখ, ইমাম, অনন্যসাধারণ[৩], তত্ত্বান্বেষী[৪], বাস্তবতার উন্মেষকারী[৫], উম্মতের এবং দ্বীনের পুনরুজ্জীবনদানকারী[৬] আবু আবদুল্লাহ মোহাম্মদ ইবনে আলি ইবনে আরাবী তাঈ আন্দালুসী মাগরিবীর (আল্লাহ্‌ তাঁর আত্মাকে পবিত্র করুন) পক্ষ হতে মহাজ্ঞানী, সম্পাদক[৭], প্রজ্ঞাময়, দ্বীন ও উম্মতের গর্ব মোহাম্মদ ইবনে উমর খতিব রাযির (আল্লাহ্‌ তাঁকে প্রাচুর্য দিন এবং জান্নাতকে তাঁর আবাসস্থল করুন নিকট) [প্রেরিত]।

আল্লাহ্‌র প্রশংসা এবং নবীর প্রতি সালাম

প্রশংসা আল্লাহ্‌র এবং সালাম আল্লাহ্‌র বিশেষভাবে পছন্দনীয় বান্দাদের উপর। আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য (সালাম বর্ষিত হোক) আমার সাথী ফখরুদ্দিন মোহাম্মদের উপর, আল্লাহ্‌ তাঁর উচ্চবাসনা[৮]কে বৃদ্ধি করুন এবং তাঁর উপর রহমত ও বরকত ঢেলে দিন।

অতপরঃ

তোমরা একে অপরকে সত্যের উপদেশ প্রদান করো

আমি তোমার নিকট আল্লাহ্‌র প্রশংসা করছি, যিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) বলেছেন: "তোমাদের কেউ যখন তার ভাইকে ভালবাসে, সে যেন তাকে তা সর্ম্পকে অবহিত করে।"[৯] আর আমি তোমাকে ভালবাসি। মহান আল্লাহ্‌ বলেন:

---

[৩] মুফরিদ

[৪] মুহাক্কিক

[৫] কাশিফ আল হাকিকাহ

[৬] মুহ্‌ই মিল্লাত ওয়া দীন

[৭] তানহীর

[৮] হিম্মা : ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, অভিলাষ ইত্যাদি

[৯] মুসনাদে আহমাদ, আদাবুল মুফরাদ, আবু দাউদ, তিরমিযি, হাকিম ইবনে হিব্বানে কাছাকাছি শব্দে

وَتَوَاصَوْاْ بِٱلْحَقِّ

"তোমরা একে অপরকে সত্যের উপদেশ দেও।"[১০]

আমি তোমার কিছু রচনাবলী পেয়েছি, আল্লাহ্ তোমার সৃষ্টিশীল মনন[১১] দ্বারা সেসবে সহায়তা করুন এবং সেসবে উন্নত চিন্তা ভরিয়ে দিন।

নিজ হাতের অর্জিত জ্ঞান এবং আল্লাহ্ প্রদত্ত জ্ঞান

যখন নফস তার নিজস্ব-অর্জন[১২] দ্বারা পরিপুষ্ট হয় তখন সেটা মহানুভবতা[১৩] এবং অনুদানের[১৪] স্বাদ আস্বাদন করে না। আর যে পায়ের নিচ থেকে আহার করে সে তাদের অন্তর্ভূক্ত হয়। আর পুরুষতো সে যে তার উপর হতে আহার করে। যেমনভাবে মহান আল্লাহ্ বলেন:

وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُواْ ٱلتَّوْرَاةَ وَٱلإِنْجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيهِمْ مِّن رَّبِّهِمْ لأَكَلُواْ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم

"যদি তারা তাওরাত ও ইনজিল এবং যা তাদের প্রভুর পক্ষ হতে তাদের উপর নাযিল হয়েছে তাকে প্রতিষ্ঠিত করতো তবে তাদের উপরের আসমান এবং পায়ের নিচের জমিন থেকে আহার করানো হতো।"[১৫]

পরিপূর্ণ-উত্তরাধিকার

আমার সাথী, মহান-আল্লাহ্ তোমায় জ্ঞান দিন, তোমার জানা উচিত যে, পরিপূর্ণ-উত্তরাধিকার সকল দিক দিয়েই পূর্ণ হয়। যেটা আংশিকভাবে পূর্ণ থাকে (সেটা পরিপূর্ণ-উত্তরাধিকার) নয়। "জ্ঞানীরা নবীদের উত্তরাধিকার"[১৬]। জ্ঞানীদের জন্য এটা আবশ্যক যে, তারা সকল দিক দিয়ে উত্তরাধিকার হওয়ার জন্য কঠোর প্রচেষ্টা চালাবে এবং অসম্পূর্ণ অভিলাষের দিকে ধাবিত হবে না।

---

[১০] কুর'আন, আসর, ১০৩:৩

[১১] কুওয়াতুল মুতাখাইয়িলা

[১২] কাসবুল ইয়াদাই

[১৩] জুউদ

[১৪] ওহব

[১৫] কুর'আন, মায়িদাহ, ৫:৬৬

[১৬] আল হাদিস

সৌন্দর্য হচ্ছে মানবীয়-শ্রেষ্ঠত্ব

আমার সাথী, মহান-আল্লাহ্ তোমায় জ্ঞান দিন, তুমি তো জানো যে: সৌন্দর্য হচ্ছে মানবীয়-শ্রেষ্ঠত্ব যেটা কেবলমাত্র ঐশ্বরিক-তত্ত্বজ্ঞান[১৭] দ্বারা লাভ করা যায়। অন্যদিকে কদর্যতা হচ্ছে এর সম্পূর্ন বিপরীত।

জীবনকে অযথা কাজে নষ্ট না করা

উচ্চ-অভিলাষীদের জন্য এটা আবশ্যক যে, সে তার জীবনকে কেবল অনিত্য জিনিস[১৮] এবং তা সংক্রান্ত বর্ণনার পিছনে (নিয়োজিত করে) নষ্ট করবে না। এই কাজের দ্বারা সে তার প্রভু হতে প্রাপ্ত অংশকে নষ্ট করে। একইভাবে তার জন্য এটা আবশ্যক যে, সে তার সত্তাকে তার চিন্তাশীল-রাজ্য[১৯] হতে অবমুক্ত করবে। কেননা চিন্তা কেবল তার উৎপত্তিস্থল সম্পর্কে অবগত। কিন্তু সত্য যেটাকে তালাশ করা হচ্ছে তা এরূপ নয়। কেননা আল্লাহ্র-জ্ঞান আর আল্লাহ্র অস্তিত্বের-জ্ঞান ভিন্ন জিনিস।

নেতিবাচক পদ্ধতি এবং তার সীমাবদ্ধতা

জ্ঞানীগন আল্লাহ্কে তাঁর অস্তিত্ববান-সত্তার[২০] দিক দিয়ে জানে আর সেটা নেতিবাচক পদ্ধতির[২১] মাধ্যমে (অর্জিত হয়) কিন্তু সেটা প্রতিষ্ঠাকরণ পদ্ধতির মাধ্যমে সম্পন্ন হয় না। এইমতটি অধিকাংশ জ্ঞানীগুণী এবং ধর্মতত্ত্ববিদদের দল থেকে ভিন্ন।[২২] এইক্ষেত্রে আমাদের নেতা আবু হামিদ[২৩], আল্লাহ্ তাঁর আত্মাকে পবিত্র করুন, ব্যতিক্রম যেহেতু এ ব্যাপারে তিনি আমাদের সাথে সহমত পোষণ করেন। চিন্তা-গবেষণা[২৪] এবং

---

[১৭] মাআরিফ আল-ইলাহিয়া

[১৮] মুহদাছ

[১৯] সুলতান আল-ফিকর

[২০] কাওন আল-মাওজুদাত

[২১] সালব

[২২] এর সরল মানে দাড়াচ্ছে যে, জ্ঞানীগন আল্লাহকে তাঁর অস্তিত্ববান-সত্তার দিক দিয়ে জানে। এ পদ্ধতিকে অধিকাংশ ধর্মতত্ত্ববিদ ইতিবাচক মনে করেন। কিন্তু ইবনে আরাবীর মতে এ পদ্ধতিটি আসলে নেতিবাচক। যেটা অধিকাংশ ধর্মতত্ত্ববিদদের মতের বিপরীত।

[২৩] আল গাযালী

[২৪] ফিকর

চিন্তা-পর্যবেক্ষণের[২৫] মাধ্যম দিয়ে বোধশক্তি[২৬] আল্লাহ্‌কে জানবে, এই ধারণা থেকে মহান আল্লাহ্ থেকে অধিকতর মহিমাময়, মর্যাদাময় এবং সুউচ্চ।

আধ্যাত্মিক প্রত্যক্ষকরণ[২৭]

জ্ঞানীদের জন্য এটা আবশ্যক যে, আধ্যাত্মিক-প্রত্যক্ষকরণের দ্বারা যখন সে মহান-আল্লাহ্‌র তত্ত্বজ্ঞান লাভের ইচ্ছা করবে তখন সে তার অন্তরকে চিন্তা-গবেষণা হতে স্বাধীন করবে। উচ্চ-অভিলাষীদের জন্য আবশ্যক যে, সে কাল্পনিক জগতের[২৮] দ্বারা এ বিষয়টির সামনে দাড়াবে না। (যেহেতু এ জগত) আলোকময় দেহ[২৯] ধারণ করে। (এসব আলোকময় দেহ) তাদের (বাহ্যিক-রূপের) ভিন্ন অর্থ প্রদান করে। কল্পনা জ্ঞানগর্ভ অর্থকে[৩০] ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অর্থে[৩১] নামিয়ে দেয়। উদাহরণস্বরূপ জগতকে দুধের উপমায়, কুরআনকে দড়ির উপমায় এবং দ্বীনকে শেকলের উপমায় (প্রকাশ করে, এসব তাদের বাহ্যিক রূপের বিপরীত)।

বৈশ্বিক সত্তা এবং ফকির শব্দটির আসল মানে

উচ্চ-অভিলাষীদের জন্য এটা আবশ্যক নয় যে, বৈশ্বিক-সত্তা[৩২] থেকে (তত্ত্ব-জ্ঞান) আহরণের ক্ষেত্রে তার শিক্ষক এবং প্রত্যক্ষকারী হবে মহিলা, যেমনিভাবে এটা তার জন্য আবশ্যক নয় যে: আহরণের ক্ষেত্রে সে নিজেকে এমন জিনিসের সাথে সম্পৃক্ত করবে যেটা সত্তাগতভাবে অন্যের উপর নির্ভরশীলতার কারনে গরীব। যে জিনিসটি তার নিজ সত্তা ভিন্ন অপরের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় সে জিনিসটিই গরীব। মহান আল্লাহ্ ভিন্ন সমস্ত কিছুর অবস্থা হচ্ছে এরূপ।

---

[২৫] নযর

[২৬] আকল

[২৭] মুশাহাদাত

[২৮] আলাম আল-খেয়াল

[২৯] আনওয়ার আল মুতাজাস্‌সাদ

[৩০] মা'আনি আল-আকলি

[৩১] কাওয়ালিবুল হিস্‌সিয়া

[৩২] নফস আল কুল্লি

আল্লাহ্ ব্যতীত কোনো কর্ম সম্পাদনকারী নেই

সেজন্য তুমি তোমার উচ্চ-অভিলাষকে এমনভাবে উপরে উন্নীত করো যাতে তুমি কাশফের মাধ্যমে আল্লাহ্ হতে তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ করো। তত্ত্বান্বেষীদের কাছে আল্লাহ্ ব্যতীত কোনো কর্ম-সম্পাদনকারী নেই। আর তাই তারা আল্লাহ্ হতে তত্ত্ব-জ্ঞান আহরণ করে বাঁধনের[৩৩] মাধ্যমে, উন্মোচনের মাধ্যমে নয়।

আল্লাহ্র পরিজন

চাক্ষুষ-নিশ্চয়তা[৩৪]র দিকে মিলিত হওয়া ব্যতীত আল্লাহ্র-পরিজনরা[৩৫] তাদের অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌছায় না। তাই (তারা নিজেদেরকে) জ্ঞানগত-নিশ্চয়তাতে[৩৬] আবদ্ধ হওয়া থেকে বিরত রাখে।

চিন্তাগবেষণা এবং অন্ধ অনুসারী

জেনোরাখো, চিন্তা-গবেষণার লোকজন[৩৭] যখন চিন্তা-গবেষণার চূড়ান্ত উচ্চতায় পৌছে যায় তখন তাদের নিজস্ব চিন্তা-গবেষণা তাদেরকে শ্রবণশক্তিহীন অন্ধ অনুসারীতে পরিণত করে। (তত্ত্বজ্ঞানের) এ ব্যাপারটা এতোই উচ্চ যে, চিন্তা-গবেষণা সেখানে আটকে যায়। যতক্ষণ চিন্তা-গবেষণা সেখানে বিদ্যমান থাকে ততক্ষণ এটা অসম্ভব যে, একজন তাতে প্রশান্তি ও পরিতৃপ্তি লাভ করবে। চিন্তা-গবেষণার সাথে সম্পৃক্ত কর্মতৎপরতাকে[৩৮] বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বোধশক্তির একটি নির্দিষ্ট সীমা রয়েছে, যেখানে সে আটকে যায়। এটার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এটা মহান আল্লাহ্ যা প্রদান করে তা গ্রহণ করে নেয়।

আর তাই উচ্চাভিলাষীদের জন্য এটা আবশ্যক যে, সে নিজেকে ঔদার্যময়-ঐশ্বরিক দমের[৩৯] মুখোমুখি করবে এবং নিজেকে তার চিন্তা-পর্যবেক্ষণ এবং তার অর্জিত-

---

[৩৩] আকদ

[৩৪] আইনুল ইয়াক্বিন

[৩৫] আহলুল আল্লাহ

[৩৬] ইলমুল ইয়াকিন

[৩৭] আহল আল ফিকর

[৩৮] তাসার্‌রূপ আল ফিকরি

[৩৯] নাফহাত আল জুদ

জ্ঞানের শিকলে বন্দি করে রাখবে না। কেননা সেতো এসবের জন্যই তার সন্দেহে পড়ে আছে।

রাযির দিশেহারা মানসিক অবস্থা

তোমার সহকর্মী ভাইদের মাঝে একজন যাকে আমি বিশ্বাস করি, যে তোমার শুভাকাঙ্খীদের একজন আমাকে খবর দিয়েছে যে, একদিন সে তোমাকে কাদঁতে দেখেছে। সে এবং যারা সেখানে উপস্থিত ছিলো তারা তোমার কান্না সম্পর্কে প্রশ্ন করে। তার উত্তরে তুমি বলেছিলে:

> "অমুক বিষয়ে ত্রিশ বছর যাবত আমি যা বিশ্বাস করেছিলাম একটি প্রমাণের মাধ্যমে আজ সেটা পরিষ্কার হয়েছে এবং আমার কাছে উদ্ভাসিত হয়েছে যে, এতদিন আমি যা বিশ্বাস করতাম বিষয়টি আসলে তার সর্ম্পূণ বিপরীত। তাই আমি ক্রন্দন করছি এবং বলছি, যেটা আমার কাছে এখন উদ্ভাসিত হয়েছে সেটাও যদি প্রথম বিশ্বাসের মতই হয়ে থাকে।"

আর এটাই তোমার বক্তব্য।

কেবল যুক্তি দিয়ে আল্লাহ্‌কে পাওয়া যায় না

এটা তত্ত্বজ্ঞানীর জন্য অসম্ভব যে, সে যুক্তিতর্ক এবং চিন্তা-গবেষণা দ্বারা প্রশান্তি এবং মুক্তি লাভ করবে, আর যদি সেটা বিশেষভাবে হয়ে থাকে মহান আল্লাহ্‌র তত্ত্বজ্ঞান। এটা অসম্ভব যে, সে তাঁর (আল্লাহ্‌র) সত্তাকে[৪০] চিন্তা-গবেষণা বা যুক্তি তর্কের রাস্তা দিয়ে জানবে।

তত্ত্বজ্ঞান লাভের পথ

হে আমার ভাই! তুমি এই দুর্দশাতে আটকে আছো এই জন্য যে, তুমি আধ্যাত্মিক-প্রচেষ্টা[৪১], আধ্যাত্মিক-সাধনা[৪২], অবমুক্তকরণের[৪৩] পথে প্রবেশ করছো না।

---

[৪০] মাহিয়া

[৪১] রিয়াযাত

[৪২] মুজাহাদাত

[৪৩] খালওয়াত

যেটাকে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) নির্ধারন করেছেন। এর মাধ্যমে তুমিও তা পাবে যা সেই বান্দাটি পেয়েছেন। যেই বান্দা সর্ম্পকে মহান আল্লাহ্ বলেন:

عَبْداً مِّنْ عِبَادِنَآ آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْماً

"আমার বান্দাদের মাঝে একজন যাকে আমরা আমাদের নিকট হতে রহমত প্রদান করেছি এবং তাকে আমরা আমাদের পক্ষ হতে তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা দিয়েছি।"[৪৪]

এই জন্য তোমার মতো লোকের উচিত এই মর্যাদাময়, সুউচ্চ এবং সুমহান কর্মের মুখোমুখি হওয়া।

কার্যকারণ ও তার বিভিন্ন দিক, তত্ত্বজ্ঞানীরা কার্যকারণের দিকে মনোযোগী নন

আমার সাথী, মহান-আল্লাহ্ তোমায় জ্ঞান দিন, তোমার জানা উচিত প্রতিটি অস্তিত্ববান জিনিসই একটি কার্যকারণের[৪৫] মাধ্যমে অস্তিত্বশীল আর এই কার্যকারণটি তার মতোই অনিত্য বা ধ্বংসশীল। এর দুটো দিক রয়েছে: একদিক হচ্ছে, যেটা কার্যকারণের দিকে দৃষ্টিপাত করে। অপর দিক হচ্ছে, যেটা দিয়ে তার অস্তিত্ব-প্রদানকারীর[৪৬] দিকে দৃষ্টিপাত করে, আর অস্তিত্ব-প্রদানকারীই হচ্ছেন আল্লাহ্। সমস্ত লোকজন এবং জ্ঞানীগুণী ও দার্শনিক সবাই অস্তিত্ববান হবার কার্যকারণের দিকে মনোযোগী। কিন্তু মহান আল্লাহ্‌র-পরিজনদের মধ্যে তত্ত্ব-জ্ঞানীগন এই নিয়মের ব্যতিক্রম। যেমনভাবে নবী, আউলিয়া এবং ফেরেশতাগন, তাঁদের উপর সালাম বর্ষিত হোক, এই নিয়মের ব্যতিক্রম। কেননা তাঁরা অস্তিত্ববান হবার কার্যকারণকে অবগত হবার সাথে সাথে তারা অপরদিকটি দিকেও সমানভাবে দৃষ্টি আবদ্ধ রাখেন (সে অপরদিকটা হচ্ছে) তাদের অস্তিত্ব-প্রদানকারীর দিক।

তত্ত্বজ্ঞানীদের মধ্যে দু'দল

তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ তাঁর প্রতিপালককে তাঁর সত্তার দিক দিয়ে দৃষ্টিপাত না করে তাঁর কার্যকারণের দিক দিয়ে দৃষ্টিপাত করে। তাই তাঁরা বলে, "আমাকে বর্ণনা করছে আমার অন্তর, আমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে", অন্যজন যে পরিপূর্ণ সে বলে,

[৪৪] আল কাহাফ ১৮:৬৫

[৪৫] সবব

[৪৬] মুজিদ

"আমাকে বর্ণনা করছে আমার প্রতিপালক।" এই কথার দিকেই আমাদের তত্ত্ব-জ্ঞানী সাথী ইশারা করছে: তা হলো, "তোমরা তোমাদের জ্ঞানকে গ্রহণ করছো মৃত বাহক হতে মৃত বাহকের মাধ্যমে, আর আমরা আমাদের জ্ঞান গ্রহণ করছি প্রাণবান সত্তা হতে, যার কোনো মৃত্যু নেই।"

আর যার অস্তিত্ব নিজ সত্ত্বা-ভিন্ন অন্যকিছু থেকে উৎসারিত তার ব্যাপারে আমার সিদ্ধান্ত হলো সেটা কোনো জিনিসই না। আর তত্ত্বজ্ঞানীর জন্য নিশ্চিতভাবেই আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য কিছুতেই কোনো আস্থা নেই।

আল্লাহ্‌র বিভিন্ন নাম এবং তাদের ধরন

অতঃপর আমার সাথী তোমার জানা উচিত যে, যদিও আল হক্ক বা **পরম সত্য** এক কিন্তু আমাদের কাছে নিশ্চিতভাবেই তাঁর ভিন্ন-ভিন্ন অনেক দিক রয়েছে। আর তাই এ আলোচনা হতে তুমি ঐশ্বরিকতার আগমন[৪৭] এবং তাঁর আত্মবিকিরণের[৪৮] ব্যাপারে সর্তক হও। প্রতিপালকের[৪৯] দৃষ্টিকোন এবং সুরক্ষা-প্রদানকারীর[৫০] দৃষ্টিকোন হতে **পরম সত্য** তোমার নিকট এক রকম নয়। ঠিক তেমনি দয়াময়ের[৫১] দৃষ্টিকোন এবং প্রতিশোধ-গ্রহণকারীর[৫২] দৃষ্টিকোন হতে **পরম সত্য** তোমার নিকট এক রকম নয়। এটা সকল নামসমূহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

আল্লাহ্ নাম সকল নামকে ধারণ করে রাখে

জেনো রাখো যে, ঐশ্বরিক দিক বা চেহারা[৫৩] বা 'আল্লাহ্' নামটি অন্য সকল নামের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায়, যেমন: প্রতিপালক[৫৪], শক্তিশালী[৫৫] বা কৃতজ্ঞতাময়[৫৬]। আর এই নামসমূহ মিলিতভাবে অনেকটা একক সত্তা বা যাতের মতো যেটা একক সত্তার

[৪৭] মাওয়ারিদুল ইলাহিয়া
[৪৮] তাজাল্লিয়াত
[৪৯] রব
[৫০] মুহাইমিন
[৫১] রহিম
[৫২] মুনতাকিম
[৫৩] ওয়াজহু
[৫৪] রব
[৫৫] ক্বাদীর
[৫৬] শাকুর

মধ্যের সমস্ত গুণাবলীকে ধারণ করে। 'আল্লাহ্' নামটি সকল নামসমূহকে ধারণকারী এবং তারা (অন্যান্য নামসমূহ) এই (আল্লাহ্) নামটিকে প্রত্যক্ষকরণ হতে সংরক্ষণ করে। এজন্যই তুমি এই (আল্লাহ্) নামটিকে কখনো প্রত্যক্ষ করতে পারবে না। যখন তিনি তোমাকে এই (আল্লাহ্) নামটি (যেটা সমস্তকিছুকে ধারণ করে) দ্বারা সম্বোধন করে তখন তুমি খেয়াল করো, কী দ্বারা তোমাকে সম্বোধন করা হচ্ছে এবং আরো খেয়াল করো যে: সেই সম্বোধন কোন অবস্থা বা প্রত্যক্ষকরণকে নির্দিষ্ট করছে। খেয়াল করো যে, ঐশ্বরিক নামসমূহের মাঝে কোনো নামটি দিয়ে দৃষ্টিপাত করা হয়েছে, তাহলে সেটাই হবে সে নাম যা দিয়ে তোমার সাথে কথা বলা হচ্ছে অথবা সে নাম যা তুমি প্রত্যক্ষ করেছো। এই বিষয়টা আকৃতির-বিবর্তনের[৫৭] মাধ্যমে বোধগম্যময় বা স্পষ্ট। উদাহরণস্বরূপ, ডুবন্ত ব্যাক্তির ব্যাপারটি বিবেচনা করো, যে চিৎকার করে বলে, "হে আল্লাহ্!" কিন্তু এর আসল মানে, "হে সাহায্যকারী!" অথবা "হে মুক্তিকারী!" অথবা "হে উদ্ধারকারী!"। ব্যাথাগ্রস্থ ব্যাক্তি যখন বলে: "হে আল্লাহ্!" তখন এর আসল মানে, "হে উপশনকারী!" অথবা "হে উদ্ধারকারী!"। এই রকম আরো অনেক উদাহরণ রয়েছে।

আকৃতির-বিবর্তন

আকৃতির-বিবর্তনের ব্যাপারে তোমার জন্য আমার বক্তব্য হচ্ছে এরূপ, যেমনটি মুসলিম তার সহিহ সংকলনে উল্লেখ করেছেন।

> মহিমাময় মহান (তাঁর) আত্মবিকিরণ প্রকাশ করবেন আর সেটা অস্বীকার করা হবে আর তা হতে পানাহ চাওয়া হবে। তাই তিনি তাদের চেনা রূপে তার আকৃতির-বিবর্তন ঘটাবেন। তখন তারা অস্বীকারের পর তাকে স্বীকার করবে।

এটাই হলো এখানে মুশাহাদা বা প্রত্যক্ষকরণের মানে। মোনাজাত বা স্রষ্টার সাথে আন্তরিক-কথোপকথন এবং ঐশ্বরিক কথাবার্তারও একই মানে।

অপ্রয়োজনীয় জ্ঞান এবং তার উদাহরণ

জ্ঞানীদের জন্য এটা আবশ্যক যে, যে জ্ঞানের মাধ্যমে তার সত্তা পরিপূর্ণতা লাভ করে সে জ্ঞান ব্যতীত সে অন্য কোনো জ্ঞান তালাশ করবে না। (সে জ্ঞান হবে এমন যে) সে সেখানে যায় জ্ঞানও যেনো তার সঙ্গী হয়। এটা মহান আল্লাহ্র তত্ত্বজ্ঞান (যেটা প্রদান এবং প্রত্যক্ষকরণের মাধ্যমে অর্জিত হয়) ছাড়া ভিন্ন কিছু নয়।

[৫৭] তাহাইয়ুলল ফি সুরাত

উদাহরণস্বরূপ, ঔষধ সর্ম্পকে তোমার জ্ঞান, যেটা কেবল সে জগতের মুখাপেক্ষী যেখানে অসুখ-বিসুখ ও রোগ রয়েছে। যখন তুমি এমন জগতে যাবে যেটা রোগ-বালাই হতে মুক্ত, তখন তুমি এই জ্ঞান দিয়ে কার চিকিৎসা করবে?

জ্ঞানীরা সেই দিকে এতো আগ্রহী নয় যেটা তার জন্য কোনো কল্যান আনে না। আর যদি সে তা অনুদানের মাধ্যমে লাভ করে, যেমন: নবীদের ঔষধ সম্পর্কিত জ্ঞান, তবে সে সেখানে থেমে থাকে না বরং সেই সাথে আল্লাহ্‌র তত্ত্বজ্ঞানও তালাশ করে। তেমনিভাবে প্রকৌশলবিদ্যা বা জ্যামিতি এর আরেকটি উদাহরণ, যেটা কেবলমাত্র ভূমির মুখাপেক্ষী। যখন তুমি চলে যাবে তখন তুমি তাকে ফেলে যাবে তার জগতে। তোমার সত্তা খালি হাতে চলে যাবে কিন্তু সাথে তার কিছুই থাকবে না। সমস্ত কর্ম ও জ্ঞানের বেলায় এটা প্রযোজ্য। প্রতিটি সত্তা আখিরাতের জগতে যাবার সময় তা ফেলে যাবে।

এমন জ্ঞান যা তার চিরসঙ্গী হবে

জ্ঞানীদের জন্য এটা আবশ্যক যে, যতটুকু তার চাহিদাকে স্পর্শ করে ততটুকু ছাড়া এসব জ্ঞান থেকে সে কিছুই সে গ্রহণ করবে না। সে জ্ঞানের প্রতি কঠোর-প্রচেষ্টা চালাবে যে জ্ঞান সে যেখানেই যাবে তার সাথে সেখানেই যাবে। আর সেটা কেবল দুই ধরনের বিশেষ জ্ঞান ব্যতীত অন্য কিছু নয়। (সে দুই প্রকার জ্ঞান হচ্ছে) মহান আল্লাহ্‌র তত্ত্বজ্ঞান এবং আখিরাতের আবাসস্থল ও সেখানের স্তর সমূহ সম্পর্কিত জ্ঞান। এই জ্ঞান অর্জনের ফলে সে এসব স্থানে এমনভাবে বিচরন করবে যেনো এটা তারই আবাসস্থল। সেই সাথে (ঐ জগতের) কোনোকিছুকেই সে আর অস্বীকার করছে না। যেহেতু সে তত্ত্ব-জ্ঞানীদের পরিজন[৫৮], অস্বীকারকারীদের পরিজন[৫৯] নহে।

আখিরাত হচ্ছে বাছাইয়ের স্থান, মিশ্রণের স্থান নয়

(আখিরাতের) এই স্থানসমূহ বাছাইয়ের স্থান[৬০], (যেটা ভ্রান্তি প্রদান করে সে) মিশ্রণের স্থান[৬১] নয়। ঐসব গোষ্ঠী হতে বাছাইয়ের মাধ্যমে যখন সে এই অবস্থানে পৌছাবে, তখন সে শুদ্ধ বা মুক্ত হয়ে যাবে। (ঐসব গোষ্ঠী হচ্ছে তারা) যখন রব বা

[৫৮] আহল আল ইরফান

[৫৯] আহল আল নুকরান

[৬০] তামাইয়ুজ

[৬১] ইমতিয়াজ

প্রতিপালক তাদের সামনে আত্মবিকিরণ করবেন তখন তারা বলবে: আমরা আল্লাহ্‌র কাছে তোমার থেকে পানাহ চাচ্ছি তুমি আমাদের রব নও। আমরা অপেক্ষায় আছি যতক্ষণ না আমাদের প্রতিপালক বা রব আসেন।

তিনি যখন তাদের কাছে তাদের পরিচিত বা চেনা কোনো রূপে আসবেন তখন তারা তাঁকে তাদের রব বা প্রতিপালক হিসেবে মেনে নিবে। এর চেয়ে কি বড় কোনো বিভ্রান্তি বা মোহাচ্ছন্নতা আছে?

জ্ঞানীদের কর্তব্য

জ্ঞানীদের জন্য এটা আবশ্যক যে, তারা এই দুটি জ্ঞানকে আবিস্কার করবে, আধ্যাতিক-প্রচেষ্টা, আধ্যাতিক-সাধনা, অবমুক্তকরণের মাধ্যমে, আর নির্দিষ্ট-কিছু শর্তের মাধ্যমে।

উপসংহার

আর আমি ইচ্ছা করেছিলাম খালওয়াত বা অবমুক্তকরণ এবং এ সর্ম্পকিত শর্তসমূহ, তা হতে যা কিছু বিচ্ছুরিত হয়, তার সবকিছু ধাপে ধাপে বর্ণনা করবো। কিন্তু সময়ের স্বল্পতা আমাকে আটকে দিয়েছে। আমি এই সময়টি দ্বারা অসৎ আলেমদের বুঝিয়েছি, যারা যা জানে না তাকেই অস্বীকার করে। **পরম সত্যে**র প্রতি আনুগত্য ও বাধ্য থাকার পরিবর্তে এরা কিনা সংকীর্ণতা, লোকদের নিকট পরিচিত হবার বাসনা, নেতৃত্ব পাবার লোভের মধ্যে নিজেদেরকে কয়েদ করে রেখেছে। যদিও তাদের মাঝে কোনো ঈমান নেই।

এটা পত্রটির শেষ অংশ।

আল্লাহ্‌ই বন্ধু হিসেবে যথেষ্ট।

শুরু ও শেষ এবং প্রকাশ্য ও গোপনভাবে তাঁরই প্রশংসা। সালাত বর্ষিত হোক তাঁর নবীর উপর, কৃতজ্ঞতায় এবং স্মরণে।

(বাংলা অনুবাদ সমাপ্ত)

ইবনে আরাবী: সংক্ষিপ্ত জীবন ও কর্ম

মুহিউদ্দিন আবু আবদুল্লাহ মোহাম্মদ ইবন আলি ইবন মোহাম্মদ ইবন আল আরাবী আল হাতেমি আত তায়ি। যিনি শেখ আল আকবর নামে পরিচিত। তিনি ইসলামের প্রভাবশালী দার্শনিক, চিন্তাবিদ ও সুফিদের মধ্যে অন্যতম ।

তিনি ২৭ রমজান ৫৬ হিজরী/৭ আগষ্ট ১১৬৫ খ্রিষ্টাব্দ সালে মুর্সিয়া, স্পেনে জন্ম গ্রহণ করেন। ৮ বছর বয়সে তার পরিবার সেভিলে চলে যায়। সেখানে তিনি আনুষ্ঠানিক শিক্ষাগ্রহণ শুরু করেন। খুবই কম বয়স হতে তিনি আধ্যাতিক স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করেন। যার খবর তার বাবার বন্ধু, বিখ্যাত দার্শনিক, ইবন রুশদের কাছে পৌছায়। তিনি ইবনে আরাবীর সাক্ষাত কামনা করেন। ইবনে আরাবী স্পেন এবং উত্তর আফ্রিকার বিভিন্ন শহরে প্রায় ১০ বছর অতিবাহিত করেন বিভিন্ন সুফি সাধকদের সাথে। ৫৯০/১১৯৪ সালে তিনি তার বাড়ি সেভিলে চলে আসেন। সে বছর যখন তার বয়স ৩০ তখন তিনি আবদুল আযিয অলি মাদাওয়ির সাথে সাক্ষাত করতে তিউনিশিয়া যান। এরপর তিনি ফেজ, কায়রো, জেরুজালেম, মক্কাসহ বিভিন্ন স্থান ভ্রমন করেন। ৫৯৮ /১২০২ সালে তিনি তার বিখ্যাত বই '*ফুতুহাত আল-মক্কিয়া*' লিখা শুরু করেন। ৬২৭/১২২৯ সালে তিনি তার বিখ্যাত এবং তাৎপর্যময় বই 'ফুসুস আল হিকাম' রচনা করেন যেটা একটা স্বপ্নের উপর রচিত। ৬৩০/১১৩৩ সালে তিনি 'ফুতুহাত আল-মক্কিয়া' রচনা এবং পরিমার্জন শেষ করেন। ২৮ রবিউল সানি ৬৩৮/১৬ নভেম্বর ১২৪০ সালে তিনি সিরিয়ার দামেস্কে কাযি মুহিউদ্দিন ইবন আল জাকির বাড়িতে ইন্তেকাল করেন।

কর্ম:

ইবনে আরাবী একজন উচ্চমানের লেখক ছিলেন। তার লিখিত বইয়ের সংখ্যা অনেক। ব্রোকেলম্যান কমবেশ ২৩৯টি কাজের কথা উল্লেখ করেছেন। ৮৪টি বই সন্দেহাতীত ভাবে ইবনে আরাবীর রচিত বা তার দ্বারা সত্যায়িত, এই বিষয়ে সাম্প্রতিক এক গবেষণাতে নিশ্চিত হওয়া গেছে। তার কিছু বিখ্যাত রচনা হলো:-

(১) **'ফুতুহাত আল-মক্কিয়া':** এটি তার বিখ্যাত কর্ম। এটি ৩৭ টি সফরে ৬টি ভাগে, ৫৬০টি অধ্যায়ে বিভক্ত। এখানে তিনি ইসলামী শরীয়ত, মারিফত নিয়ে বিস্তরিত আলোচনা করেন, যেটা তিনি ঐশ্বরিকভাবে কাবাতে এটি

বালকের শরীরে অংকিত অবস্থায় অবলোকন করেন। দীর্ঘ ৩০ বছর ধরে তিনি সেটাকে লিপিবদ্ধ করেন।

(২)**'ফুসুস আল হিকাম':** এটা তার আরেকটি বিখ্যাত বই। তিনি বইটি একটি স্বপ্নের মাধ্যমে নবী মোহাম্মদ (স.) হতে লাভ করেন আর সেভাবেই তিনি তা লিপিবদ্ধ করেন। বইটি ২৭ টি অধ্যায়ে বিভক্ত। এতে ইবনে আরাবীর সমগ্র শিক্ষার সংক্ষিপ্তসার রয়েছে। বইটি অতি উচ্চমানের এবং কঠিন প্রকৃতির। এর বহু ব্যাখ্যা গ্রন্থ রয়েছে।

(৩)**'কিতাব আল ইসরা ইলা মাকাম আল আসরা':** এখানে তার তিনটি মিরাজের বিবরণ রয়েছে।

(৪)**'তরজুমান আল আশওয়াক':** এটি তার কবিতার বই যেটা নিজামকে উদ্দেশ্য করে তিনি রচনা করেন।

(৫)**'দাখায়িরুল আলাক':** তরজুমান আল আশওয়াকের একটি ভাষ্য।

(৬)**'রিসালা রুহুল কুদস':** এতে তিনি তার সমকালিম বহু সুফির জীবন ইতিহাস সংকলন করেন।

(৭)**'তানাজজুলাত আল মাওসিলিয়াহ':** এতে তিনি ধর্মীয় রীতি নীতির আধ্যাতিক ব্যাখ্যা দেন।

(৮)**'কিতাব আল আসফার'**

(৯)**'তাজ আর রাসাইল'**

এছাড়াও আরো বহু রচনা রয়েছে।

এসব কাজের মধ্যে *'ফুতুহাত আল-মক্কিয়া'* এবং *'ফুসুস আল হিকাম'* বই দুটো তার সমগ্র শিক্ষার ভান্ডার। বই দুটো ইসলামি সুফিতত্ত্বের উপর রচিত অমূল্য রতনস্বরূপ।

'ফুসুস *আল হিকাম*' বইটির পাণ্ডুলিপির প্রথম পাতা

তাঁর চিন্তা-জগত এবং অবদানঃ

ইবনে আরাবী ইসলামের চিন্তাজগতে বিশেষ করে ইসলামি সুফিতত্ত্বে আলোড়ন তৈরি করার মতো বহু তত্ত্ব নিয়ে আসেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে: 'ইনসানে কামিল', 'প্রতি মুহূর্তে নতুন সৃষ্টি', 'খাতামুল আউলিয়া' এবং 'ওহদাতুল ওজুদ'।

এদের মধ্যে ওহদাতুল ওজুদের জন্যই তিনি সবচেয়ে বিখ্যাত এবং বিরুদ্ধবাদীদের নিকট সমালোচিত। মজার ব্যাপার হচ্ছে ইবনে আরাবী তার লেখার কোথাও 'ওহদাতুল ওজুদ' শব্দটি ব্যবহার করেন নি, তার লেখার মধ্যে তিনি কেবল 'ওজুদ' (স্রষ্টার অস্তিত্ব) ব্যবহার করেছেন। এমনকি তার শিষ্যদের লেখাতেও এর ব্যবহার খুব একটা চোখে পড়ে না। ইবনে আরাবী ও তার পূর্বের এবং সমসাময়িকদের মধ্যে যদিও 'ওহদাতুল ওজুদ' পরিভাষাটির ব্যবহার উল্লেখ করার মতো নয়, তথাপিও এই বিষয়টি তৎকালীন সমাজে কোনো বির্তকের জন্ম দেয়নি। 'ওহদাতুল ওজুদ' বিষয়ে দুটি রচনা লিখে এবং একে ভয়ানকভাবে সমালোচনা করে ইবনে তাইমিয়াই (১২৬৩-১৩২৮) প্রথম বির্তকের সূচনা করে। তার সমালোচনার প্রধান দিক হচ্ছে, 'ওহদাতুল ওজুদ' স্রষ্টা এবং সৃষ্টিকে একাকার করে ফেলে এবং ফলশ্রুতিতে হুলুল[৬২] এবং ইত্তেহাদে[৬৩]র মতো ভয়ানক গোমরাহিতে পতিত হতে হয়। তার আনিত অভিযোগসমূহ পরবর্তিতে নানা পথ ও জনের মধ্যে দিয়ে ঘুরপাক খেয়ে আহমদ শেরহিন্দের (১৫৬৪-১৬২৪) মাধ্যমে পুনরায় প্রতিধ্বনিত হয় এবং শেষে আহমেদ শেরহিন্দ 'ওহদাতুশ শুহুদ' নামে এর বিকল্প তত্ত্ব প্রদান করেন[৬৪]। যাই হোক এবার আমি সংক্ষেপে ইবনে আরাবীর তত্ত্বগুলো আলোচনা করি।

ইবনে আরাবীকে বুঝতে হলে প্রথমত আপনাকে সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝতে হবে।

"আল্লাহ্ আছেন এবং কোনো জিনিসই তাঁর সাথে নেই।"

---

[৬২] সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহ্র প্রবেশ এবং দেহ-ধারণ করা

[৬৩] আল্লাহ্ এবং সৃষ্টির একত্রিত হওয়া

[৬৪] আহমেদ শেরহিন্দের এই মতটি এখন বেশ জনপ্রিয় হলেও বাস্তবতা কিন্তু ভিন্ন। ঐ সময়ের অধিকাংশ সুফিই তার এই মতবাদকে প্রত্যাখ্যান করে। মজার একটি দিক হচ্ছে শাহ ওয়ালিউল্লাহ আবার প্রমাণের চেষ্টা করেছেন যে, আহমেদ শেরহিন্দ আসলে ইবনে আরাবীর বিরোধিতা করেন নি। এ ব্যাপারে শাহ ওয়ালিউল্লাহ ব্যাপক আলোচনা করেন।

"আমি একটি গুপ্তভান্ডার ছিলাম। কিন্তু আমি ভালোবাসলাম যে,
আমি জ্ঞাত হবো, তাই আমি জগত সৃষ্টি করলাম।"

ইবনে আরাবীর সৃষ্টিতত্ত্ব এই হাদিসগুলোর আলোকে গঠিত। (তাঁর মতে সৃষ্টিতত্ত্ব) সমস্তকিছু সৃষ্টির পূর্বে যখন কিছুই ছিলো না তখন শুধু আল্লাহ্ ছিলেন, একাকিত্বের এই অবস্থায় তিনি তাঁর সত্তার মনোমুগ্ধকর সৌন্দর্য দেখলেন এবং তিনি তাঁর সত্তাকে প্রচন্ড ভালোবাসলেন এবং ইচ্ছা করলেন যে, তাঁর এই গুপ্ত সত্তা প্রকাশিত হোক। তাই তিনি তাঁর সত্তার একটি আকার তৈরি করলেন। এমনভাবে তিনি এ আকারটি বানালেন যে, এটি তার সত্তার সমস্তকিছুকে ধারণ করে। মূলত এটি হচ্ছে মাধ্যমবিহীন আল্লাহ্র **প্রথম সৃষ্টি**। এই **প্রথম সৃষ্টি**কে সুফি মহলে **নুরে মোহাম্মদ** বলে এবং ইবনে আরাবীর ভাষায় এটি প্রথম অন্ধকার (আল-'আমা আল মুতলাক)। এটি আল্লাহ্র সমস্ত গুণাবলীকে ধারণ করে। আল্লাহ্ তখন এই **প্রথম সৃষ্টি**কে বললেন, **"হও"** আর এখান থেকে সমগ্র জগত সৃষ্টির প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়। আরশ, কুরসি থেকে নিহারিকা, নভোমন্ডল, ভূমন্ডল, অনু-পরমানুসহ সমস্তকিছুই এই **"হও"** আদেশের মাধ্যমে অস্তিত্বে আসে। কিন্তু এই জগত অনেকটা পালিশ ছাড়া আয়নার মতো, যেটা আল্লাহ্র সমগ্র গুণাবলীকে ধারণ করতে পারে না। অর্থাৎ **প্রথম সৃষ্টি** বা **নুরে মোহাম্মদ** আল্লাহ্র সমগ্র গুণাবলীকে ধারণ করতে পারলেও, **প্রথম সৃষ্টি** বা **নুরে মোহাম্মদি** যখন বিবর্তনের মাধ্যমে বহু ধাপ অতিক্রম করছে তখন তাতে আল্লাহ্র গুণাবলীর লীলাখেলা সামগ্রিকভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে না। আর সেটা দূর করার জন্য তিনি আদম বানালেন এবং আদমের ভিতরে তিনি নিজের **রূহ** ফুঁকে দিলেন। যার মাধ্যমে আদম পরিণত হলেন **ইনসান আল কামিলে** বা পরিপূর্ণ মানবে। **ইনসান আল কামিল** বা পরিপূর্ণ মানবের মানে হচ্ছে, এতে আল্লাহ্র সমস্ত গুণাবলী প্রতিফলিত হবে। সংক্ষেপে এ হলো ইবনে আরাবীর **সৃষ্টিতত্ত্ব**। কিছু প্রশ্ন আসে যদি আপনারা খেয়াল করেন।

কানা আল্লাহু লা শাঈয়ুন মা'আহু

"আল্লাহ্ আছেন এবং কোনো **শাঈ** তাঁর (বা তাঁর একান্ত সত্ত্বার) সাথে নেই।"

(**শাঈ**) শব্দটির বাংলা মানে হচ্ছে জিনিস বা বস্তু। **শাঈয়ের** মানে কি? এখানে **শাঈয়ের** মানে: যা কিছু আল্লাহ্র সত্তার বাহিরে রয়েছে তার সবকিছুই এই **শাঈয়ের** অন্তর্ভূক্ত। এই **শাঈ** হচ্ছে **প্রথম সৃষ্টি** বা **নুরে মোহাম্মদি**। এই **শাঈকে** আল্লাহ্ বললেন, **"হও"** আর সেটা তৎক্ষণাত হয়ে গেলো। এই **শাঈ**-এর কি আলাদা স্বাধীন কোনো অস্তিত্ব আছে? যদি থেকে থাকে তবে সেটা কিরূপ?

শাঈ-এর যদি আলাদা অস্তিত্ব থাকে তবে সেটা আল্লাহ্‌র তাওহীদকে নষ্ট করে সেখানে দ্বিত্ববাদ প্রতিষ্ঠা করছে। কেননা তাওহীদের চূড়ান্ত মানেই হচ্ছে সর্বত্র আল্লাহ্‌র এককত্ব প্রতিষ্ঠা করা। আর এখানে অস্তিত্বের ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র এককত্ব বজায় থাকছে না। বরং এখানে **আল্লাহ্** ও **শাঈ** এ দুটো আলাদা সত্তার অস্তিত্ব বিরাজ করছে। আর এটা উপরের হাদিসের ঘোর পরিপন্থি। যেখানে স্পষ্টতই বলা আছে, কেবল আল্লাহ্ আছেন (আল্লাহ্ ছিলেন, আছেন এবং থাকবেন কেননা তিনি কাল, স্থানসহ সবকিছুর উর্ধ্বে) এবং তাঁর সাথে **কোনো জিনিসই নেই**। এখান থেকে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে যে, **কেবল এবং কেবলই আল্লাহ্‌র সত্তাই অস্তিত্ববান এবং কোনো কিছুই অস্তিত্ববান নয়**। সুতরাং তাত্ত্বিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হলো যে, আল্লাহ্‌র সত্তাই **অস্তিত্ববান**।

তাহলে **শাঈ** বা **প্রথম সৃষ্টি** বা **নুরে মোহাম্মদি** এবং এতে হয়ে চলা ক্রমবর্ধমান সৃষ্টির কি খবর? এটার কি কোনো অস্তিত্বই নেই? তবে আমাদের সামনে উপস্থিত এসব কি? এরা কোথায় রয়েছে?

ইবনে আরাবীর কাছে এর উত্তর খুবই সহজ। **শাঈ** বা **প্রথম সৃষ্টি** বা **নুরে মোহাম্মদি** এবং এতে হয়ে চলা ক্রমবর্ধমান সৃষ্টি সব কিছুই মাহান আল্লাহ্‌র ঐশ্বরিক কল্পনা বা জ্ঞানে সম্পন্ন হচ্ছে। **শাঈ** বা **প্রথম সৃষ্টি** বা **নুরে মোহাম্মদি** এবং এতে হয়ে চলা ক্রমবর্ধমান সৃষ্টি সবকিছুই মহান আল্লাহ্‌র কল্পনা বা জ্ঞানে রয়েছে। অর্থাৎ এই সবকিছুরই অস্তিত্ব আছে আর সে অস্তিত্ব মহান আল্লাহ্‌র কল্পনা বা জ্ঞানে। এই ব্যাপারটাকে আমাদের কল্পনাশক্তি বা স্বপ্নের সাথে তুলনা করলে বিষয়টি বোঝা খুবই সহজ হবে। আমরা যখন কোনো কিছু কল্পনা করি বা স্বপ্ন দেখি, তখন কল্পনা বা স্বপ্নে সে বস্তুর অস্তিত্ব থাকে কিন্তু বস্তুটি আলাদা ভাবে আমাদের কল্পনা বা স্বপ্নের বাহিরে অস্তিত্ববান হয় না। সৃষ্টি হচ্ছে এরূপ। যদিও আল্লাহ্‌র কল্পনা বা জ্ঞান আমাদের কল্পনা বা জ্ঞানের বহু উর্ধ্বে।

এটাই হচ্ছে ইবনে আরাবীর **"ওহদাতুল ওজুদ"** তত্ত্বের সরল এবং সংক্ষিপ্ত বিবরণ যদিও শেখ আল আকবর কখনোও এই পরিভাষা ব্যবহার করেন নি।[৬৫]

[৬৫] যারা কোয়ান্টাম পদার্থবিজ্ঞান জানেন তাদের কাছে ইবনে আরাবীর বর্ণিত তত্ত্বগুলো কোন সাধারণ তত্ত্ব নয় বরং কোয়ান্টাম পদার্থবিজ্ঞানের বহু সিদ্ধান্তই তিনি তাঁর রচিত বইগুলোতে আলোচনা করেছেন। এর কিছু উদাহরণ পেতে হাজ মোহাম্মদ ইউসুফের রচিত *Ibn 'Arabi - Time and Cosmology* নামক বইটি পড়তে পারেন।

যারাই ইবনে আরাবীর সমালোচনা করেছেন তাদের কেউই ইবনে আরাবী বা উনার শিষ্যদের শিক্ষাকে ভালভাবেভাবে উপলব্ধি না করেই তার সমালোচনা করেছে।

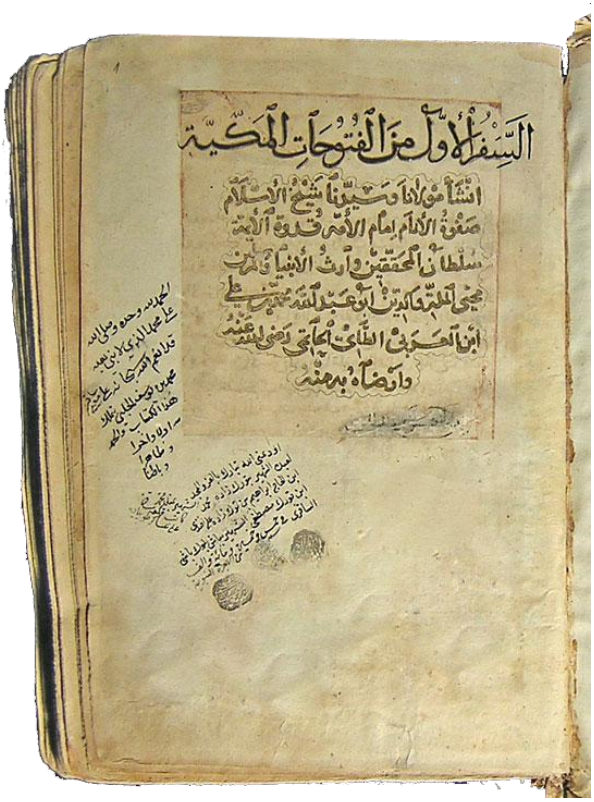

'ফুতুহাত আল-মক্কিয়া' বইয়ের পাণ্ডুলিপির একাংশ

প্রভাবঃ

মুসলিম ইবনে আরাবীর প্রভাব ব্যাপক। এমন নয় যে সমস্ত মুসলিমরা ইবনে আরাবীকে চেনে এবং সবাই তার শিক্ষাকে মেনে চলছে। বরং ইবনে আরাবীর শিক্ষা বিভিন্নভাবে তার শিষ্য, অনুসারীদের মাধ্যমে সর্বত্র বিস্তৃত হয়। অটোমান তুরস্কে ইবনে আরাবীর সৎ-পুত্র সদরুদ্দিন কুনাভি এবং কুনাভির শিষ্যদের মাধ্যমে এমনভাবে ছড়িয়ে পড়ে যে, অটোমান শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে ***"ফুসুস আল হিকাম"*** পাঠ্যপুস্তকের মর্যাদা পায়। পারস্যে এবং হিন্দুস্থানে[৬৬] ফারসি ভাষার সুফি সাধকদের মাধ্যমে তার শিক্ষা বিস্তৃত হয়, নুরুদ্দিন আল জামি[৬৭] এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করেন।

রুমি, হাফিজ, সাদি, জামি, কাসানী, কায়সারী, কুনাভি, শাবিস্তারী, লাহিজি, দারাশিকো, জিলী, ফকরুদ্দিন ইরাকি, আবদুল্লাহ বসনবি, আবদুল গনি নাবুলুসিসহ আরো হাজারো সুফি সাধকদের মধ্যে ইবনে আরাবীর ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। আর এদের মাধ্যমেই মুসলিম সমাজে ইবনে আরাবীর চিন্তা-চেতনা বিস্তৃত হয়। অনেকেই তার শিক্ষার বিরোধিতা করেন কিন্তু কোনো কিছুই তার প্রভাবকে অতিক্রম করতে পারে নি। তিনি তার স্থানে আজো রয়ে গেছেন শেখ আল আকবর হিসেবে।

[৬৬] ইংরেজদের ক্ষমতা দখলের আগে মোগল ভারতের সরকারি ভাষা ছিল ফারসি। ৮০-৯০ বছর আগেও ফারসি ভাষা আমাদের কাছে বর্তমানের ইংরেজি ভাষার মতোই ছিলো।

[৬৭] বাংলা মুসলিম সাহিত্যে জামির প্রভাব ব্যাপক। ইউসুফ-জুলেখাকে ঘিরে যতো রচনা আছে তার সবই জামির ফারসি 'ইউসুফ-জুলেখা'র অবলম্বনে রচিত।